কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানুয়ারি ২০২০

বর্ষায়ন ২০২০

আশাবাদে জেগে উঠুক জাতি

কোয়ান্টাম বর্ষ ২৮
বাস্তব সামাজিক যোগাযোগের বছর

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী,

আসসালামু আলাইকুম।

শুভ বর্ষায়ন!

২৭ বছর পেরিয়ে কোয়ান্টাম আজ পদার্পণ করল ২৮ বছরে। ২০২০-এর এই শুভক্ষণে পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা :

২০২০-এ জাতি জেগে উঠুক নতুন আশাবাদ ও প্রত্যয়ে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি বাংলাদেশ হয়ে উঠুক নৈতিক পুনরুত্থানের অনুঘটক। ভোগবিলাস, মাদক, জুয়া ও ঋণে নিমজ্জিত অস্থির-অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে উত্থান ঘটুক প্রশান্ত প্রত্যয়, সমমর্মিতা ও সামাজিক সুবিচারের। সুখী মানুষের দেশ হওয়ার পথে প্রিয় দেশ এগিয়ে যাক আরেক ধাপ।

প্রিয় শুভানুধ্যায়ী! আপনি জানেন, স্বাধীনতার এক দশক পর জাতি যখন ঘোর হতাশায় নিমজ্জিত, মানুষের অন্তর যখন নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন, তখন আমরা অনুভব করেছিলাম–ভালো থাকার জন্যে আমাদের প্রথম বলতে হবে 'ভালো আছি'।

সেইসাথে অনুভব করলাম–আমাদের একটা অন্তর্জাগরণ প্রয়োজন। আর এই অন্তর্জাগরণ ও আশাবাদের পুনরুত্থান সম্ভব একমাত্র ধ্যানের স্তর থেকেই। ধ্যানকে দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ করার সূচনা হলো ১৯৮৩ সালে 'যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র' স্থাপনের মধ্য দিয়ে। আশাবাদের বিস্তারের জন্যে শুরু করলাম 'ভালো আছি' বলা।

এক দশকের প্রয়াসে ১৯৯৩ সালে আত্মজাগরণের স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রূপ নিল 'কোয়ান্টাম মেথড' নামে।

প্রিয় শুভানুধ্যায়ী! আপনি জানেন, সিকি শতাব্দীর এই পরিক্রমায় কোয়ান্টামের আশাবাদ সঞ্চারিত হয়েছে জাতীয় মানসে। আন্তর্জাতিক জরিপ অনুসারেই আশাবাদী মানুষের দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। 'ভালো আছি' বলার শক্তি আর ধ্যানের মহিমাকে আমরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। এখন প্রয়োজন ধ্যানচর্চার মাধ্যমে আশাবাদকে প্রশান্ত প্রত্যয়ে রূপান্তর।

তাই নিজে ধ্যানচর্চা করুন। ধ্যানী হতে আশেপাশের অন্তত একজনকে সাদাকায়নে শামিল করুন। বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে ভার্চুয়াল ভাইরাসের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকুন। চারপাশে ৪০ ঘরে যোগাযোগ বাড়ান। তাদেরকে বরকতায়নে একাত্ম করুন। সন্তানকে ভালো ছাত্র বানানোর পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করুন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আপনি হোন ভালো মানুষের প্রতীক। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ! আসসালামু আলাইকুম।

[বর্ষায়নে গুরুজী ও মা-জীর শুভেচ্ছা বাণী]

বরকতান! বরকতান!! কোয়ান্টাম! কোয়ান্টাম!!

বরেণ্য পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম

বহুদূর যাওয়ার সামর্থ্য আছে এদেশের তরুণদের

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ (বাম থেকে)

বড় মানুষেরা কাউকে ছোট ভাবেন না

১৯৭২ সাল। আমি কলেজে পড়ি। টাইম ম্যাগাজিনে সে-সময় একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেখানে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়স হিসাব করে দেখানো হয়েছিল। ওটা পড়ে আমার মনে হলো, মহাবিশ্বের সত্যিকার বয়স এর চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি। আমার বাবা, যিনি সবসময় ছিলেন আমার প্রেরণা, আমাকে উৎসাহ দিলেন খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী ড. আবদুস সালামকে এ বিষয়ে চিঠি লিখতে।

অধ্যাপক সালাম তখনো নোবেল পুরস্কার পান নি। আমি সেই নিবন্ধের আলোকে তাকে বিস্তারিত লিখলাম– কীভাবে আমি দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয় করেছি। এ নিয়ে তার মতামত জানতে চাইলাম। তিনি চিঠিটি হস্তান্তর করেন বিশ্বখ্যাত একজন জার্মান জ্যোতির্বিদকে। সেই বিজ্ঞানী পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করে আমাকে দুপৃষ্ঠার একটি উত্তর লিখলেন। যা পড়ে আমি আমার হিসাব পদ্ধতির ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলাম।

এ ঘটনা থেকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেলাম। তা হলো, বড় মানুষেরা কাউকে উপেক্ষা করেন না। ছোট ভাবেন না। কারো মতামতকে অবহেলাও করেন না। একজন কলেজ শিক্ষার্থীর চিঠি বিজ্ঞানী সালাম ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারতেন। তিনি তা করেন নি; বরং তুলে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি সবচেয়ে ভালো জানেন, তার হাতে। আরো শিখলাম, বড় মানুষেরা কোনো বিষয়ে না জানলে অকপটে স্বীকার করতে জানেন।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মুক্ত আলোচনার ৯৫ তম পর্বে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও ভাবনা তুলে ধরেন বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত পদার্থবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথের নির্বাহী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম। আলাপচারিতার ভিত্তিতে এ পর্বটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াডের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত শিখি

ড. আতাউল করিম তার আলোচনায় বলেন, তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আমি ক্রমাগত নতুন চিন্তা ও উদ্যম পাই। জীবনে যা-কিছু শিখেছি, তার অধিকাংশই আমার শিক্ষার্থীদের কাছে। জীবনের অনেকটা সময় ধরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীদের কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি মনে করি, নিজে গবেষণা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো গবেষণার উপযুক্ত একটি পরিবেশ তৈরি করা। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা এবং যোগ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে কোরিয়া, মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। এখন আমাদের দেশ থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী ওখানে পড়তে যাচ্ছে।

> যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী *অ্যাপ্লাইড অপটিকস*-এর মতে, গত অর্ধশতাব্দীতে বিশ্বে বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বোচ্চ অবদান রাখা ৫০ জন বিজ্ঞানীর একজন ড. আতাউল করিম। জার্মানি ও চীন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে ম্যাগলেভ বা উড়ন্ত ট্রেনের জন্যে মাইলপ্রতি ব্যয় ছিল ১২০ মিলিয়ন ডলার। ড. করিমের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে ম্যাগলেভ ট্রেনের প্রতি মাইলের খরচ মাত্র ১১ মিলিয়ন ডলার।

এর অন্যতম কারণ হলো, আমাদের তুলনায় শিক্ষাখাতে তাদের বিনিয়োগ বেশি, তাদের আছে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ। ফলে তারা এগিয়ে গেছে।

চাই বড় লক্ষ্য

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তরুণদের সামনে বড় লক্ষ্য রাখতে হবে।

আর আমাদের কাজ হলো, তাদেরকে বড় চ্যালেঞ্জ দেয়া। পাঁচ ফুট উচ্চতায় লাফ দিতে সক্ষম একটি প্রজন্মকে যদি দুই ফুট উঁচুতে লাফ দিতে শেখানো হয়, পরের প্রজন্ম এসেও তাদের অনুসরণ করবে এবং একসময় ভুলেই যাবে যে, তাদের সামর্থ্য আছে আরো উঁচুতে লাফ দেয়ার। তাই জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় বড় করতে হবে।

দেশ এগিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ

বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ করিম বলেন, আমাদের সাধারণ মানুষই আমাদের সবচেয়ে বড় আশাবাদের জায়গা। তারাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি অনেক সম্ভাবনা দেখেছি। কিছুদিন আগে সিলেটে গিয়ে দেখেছি, একটি জমিতে কয়েক ধরনের ফসল চাষ হচ্ছে। সবমিলিয়ে আমাদের কৃষি গবেষণা এখন বিশ্বমানের।

দেশে একদিকে আবাদী জমি কমছে, অন্যদিকে মানুষ বাড়ছে কিন্তু আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর নেপথ্যে রয়েছে কৃষকের সৃজনশীলতা আর কৃষি গবেষকদের অসামান্য ত্যাগ। আমি বলতে পারি, এদেশের কৃষক উদ্ভাবনী দক্ষতায় মার্কিন কৃষকের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

অধ্যাপক আতাউল করিম বলেন, আজকের মার্কিন শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করবে সেগুলোর অধিকাংশের ধারণাই এখনো গড়ে ওঠে নি। সেখানে কী ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হবে তা আমরা জানিই না। এই সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব বর্তাবে তখনকার কর্মজীবী অর্থাৎ আজকের তরুণদের ওপর। তাই সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞান খুবই জরুরি। একজন শিক্ষার্থীর ভালো রেজাল্টের অর্থ হলো, প্রস্তুতি ভালো থাকায় পরীক্ষার দিনে সুস্থ থেকে সে সঠিক উত্তর লিখতে পেরেছে। অসুস্থ থাকলে হয়তো এমনটা না-ও হতে পারত। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে আমাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সেই কঠিন পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আমি কতটা যোগ্য, সেটাই হবে আমার সঠিক মূল্যায়ন। তাই প্রতিনিয়ত শেখার মানসিকতা ভালো রেজাল্টের চেয়েও বেশি জরুরি এবং সে শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করছি কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের তরুণ গবেষকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে গিয়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি! সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এখানকার গবেষকরা যেসব জিনিস তৈরি করেছেন, তা সত্যিই অকল্পনীয়। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের সামর্থ্য আছে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার।

সঠিক পরিকল্পনা ॥ কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক

নতুন একটি বছর। ৩৬৫ দিন। সবার জন্যে সময়ের মাপকাঠি সমান হলেও প্রাপ্তি সবার সমান হয় না। কারণ সময়কে কাজে লাগানোর ধরনে রয়েছে মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক। তাই প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, নতুন বছর হলো একটি বই আর বছরের প্রতিটি দিন একেকটি সাদা পৃষ্ঠা। বছর শেষে বইটি কেমন হবে, তা নির্ভর করছে ব্যক্তির প্রতিদিনের জীবন ও কাজের ওপর। একটি বছর আমাদের তা-ই উপহার দেয়, যা আমরা তাকে দেই।

তাই নতুন বছরে অনেক প্রত্যাশার সাথে থাকুক একটি সুন্দর ও সহজ পরিকল্পনা। কারণ সঠিক পরিকল্পনা কাজ সুসম্পন্নের অর্ধেক। কাজের প্রস্তুতি এবং প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে যিনি যত গোছানো, তার অর্জনের পাল্লা হবে তত ভারী।

কেন করবেন পরিকল্পনা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।' সহজ ভাষায় এই ছন্দই হলো সঠিক পরিকল্পনা। প্রাণপণে যারা দিগ্বিদিক ছুটে চলছে তারা নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া মানুষেরাই গন্তব্যে পৌঁছে, এগিয়ে থাকে লক্ষ্য অর্জনে। কর্মে ভারাক্রান্ত জীবনযাপন নয়, তারা উপভোগ করে সুন্দর কর্মছন্দ।

প্রথমত, পরিকল্পনা হলো রোডম্যাপের মতো। ম্যাপে একবার চোখ বোলাতে পারলে সুস্পষ্ট হয়ে যায়–কতটা পথ এলাম এবং গন্তব্যে পৌঁছতে হলে আরো কতটা পথ যেতে হবে। ফলে সময় ও সামর্থ্যকে কাজে লাগানো যায় অর্থপূর্ণভাবে।

দ্বিতীয়ত, যার একটি পরিকল্পনা আছে, জীবনের ওপর অন্যদের চেয়ে তার নিয়ন্ত্রণ বেশি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা তার জন্যে সহজ। যারা পরিকল্পনা করতে বা প্রস্তুতি নিতে অভ্যস্ত, তাৎক্ষণিক যে-কোনো প্রলোভনের ফাঁদে তাদেরকে আটকে ফেলা দুষ্কর।

তৃতীয়ত, প্রতিদিনের কাজে ছোট ছোট পরিকল্পনা ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। কারণ ছোট-বড় লক্ষ্য অর্জনে প্রতিনিয়ত তাকে বাছাই করতে হয় কোনটি জরুরি, কোনটি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি না হলেও চলবে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রশান্তি এবং সুখের জন্যেও পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। শেষ মুহূর্তের জন্যে কাজ ফেলে রাখা বা অন্যের আশায় বসে থাকা–এই দুটি বৈশিষ্ট্যই মানসিক অস্থিরতার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কাজ সম্পাদনের তৃপ্তি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ায়, তেমনি সৃষ্টি করে মানসিক প্রশান্তি।

পরিকল্পনা ও নতুন বছর

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশনের তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, ৯৩% মানুষ নতুন বছরকে কেন্দ্র করে কোনো না কোনো পরিকল্পনা করে থাকে, যার আরেক নাম নিউ ইয়ার রেজ্যুলেশন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় ৪৫% মানুষই বছরের দ্বিতীয় মাসেই হাল ছেড়ে দেয়।

যুক্তরাজ্যের হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড ওয়াইজম্যানের গবেষণা মতে, সারা বিশ্বে এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা মানুষের ৮৮% ব্যর্থ হয় তা পূরণ করতে।

এর কারণ ও সমাধান অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বাস্তবসম্মত কিছু করণীয় :

বাড়ান ইচ্ছাশক্তি

নতুন বছর এলে হঠাৎ করেই সব বদলে যাবে, শুভ পরিবর্তন আসতে থাকবে নিজের মধ্যে এবং চারপাশে–এ চিন্তা আকাশকুসুম কল্পনার শামিল। কোনো লক্ষ্য অর্জন বা ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্তনের জন্যে চাই ইচ্ছাশক্তি। ব্যক্তির চাওয়া যত বেশি হবে, ইচ্ছাশক্তি বিনিয়োগ করা চাই সেই অনুযায়ী।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, ইচ্ছাশক্তি জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা অর্জন করা যায়, এমনকি ধাপে ধাপে বাড়ানোও যায়। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা। কারণ নিজের ভেতরে ডুব দেয়া ছাড়া নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায় না।

প্রত্যাশা হোক বাস্তবসম্মত

চারপাশের মানুষ সাম্প্রতিক সময়ে কী কী করছে বা আপনাকে তারা কেমন দেখতে চায়–এর ভিত্তিতে নয়, নতুন বছরে আপনি প্রকৃতই নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চান সেই অনুসারে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

সেইসাথে মনে রাখুন, নিজের ওপর মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা চাপানো হলো কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই কয়েক হাজার ফুট উঁচু পর্বতে আরোহণ করার মতো। তাই অর্জনযোগ্য লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্যে প্রয়াস চালাতে হবে প্রতিদিন।

অস্পষ্ট লক্ষ্য ফলপ্রসূ নয়

চাওয়াকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। যেমন, ওজন নিয়ন্ত্রণ, জলদি ঘুম থেকে ওঠা–এগুলো লক্ষ্য হিসেবে অস্পষ্ট। সিদ্ধান্তে আসতে হবে কত কেজি ওজন হ্রাস করতে চান বা প্রতিদিন সকাল কয়টায় ঘুম থেকে উঠতে চান।

এর পাশাপাশি কাজের দিক-নির্দেশনাও দিতে হবে মনকে। কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে করণীয় হিসেবে রাখতে হবে প্রতিদিন হাঁটা ও ব্যায়ামের রুটিন। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠতে হলে সবরকম ডিজিটাল ডিভাইস বন্ধ করে রাত ১১টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। যদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হতে চান, খাদ্যতালিকায় গুরুপাক তেল-চর্বি ভাজা-পোড়ার স্থলে রাখতে হবে শাকসবজি ও মৌসুমি ফল, চিনির পরিবর্তে গুড়, মিষ্টির পরিবর্তে খেজুর।

অর্থাৎ প্রত্যাশার দীর্ঘ তালিকা দিয়ে মনকে কাজে নামিয়ে দিলেই চলবে না, তাকে সহযোগিতা করতে হবে সার্বক্ষণিক সহযোদ্ধার মতো।

বদলে ফেলুন আপনার পরিমণ্ডল

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত, যাদের ইচ্ছাশক্তি তুলনামূলক বেশি এবং যারা লক্ষ্যের জন্যে নিরলস কাজ করতে পারে, তাদের আরেকটি সহজাত পারদর্শিতা থাকে। তা হলো, নিজের বলয়কে তারা আত্মবিকাশের অনুকূল করে রাখতে পারে। অর্থাৎ

লক্ষ্য থেকে তাকে সরিয়ে নিতে পারে, এমন সব পরিবেশ এবং মানুষদের সান্নিধ্য থেকে তারা বেরিয়ে আসে প্রথম সুযোগেই।

তাই যদি একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে চান বড় অর্জনের জন্যে, তাহলে আলস্যপ্রিয় নেতিবাচক মানুষদের সঙ্গ বর্জন করুন। ত্যাগ করুন অর্থহীন আড্ডা ও ক্ষতিকর পরিমণ্ডল। ভার্চুয়াল ভাইরাস (স্মার্টফোন, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) আসক্তি থেকে দূরে থাকুন। বেছে নিন এমন কোনো সৎসঙ্গ যেখানে রয়েছে প্রত্যয় ও ইতিবাচকতার চর্চা।

জানুন কেন-র উত্তর

রুটিন অনুসরণ বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মানসে নিজের প্রতি অতিমাত্রায় কঠোর বা নির্মম হবেন না। জোর প্রয়োগ করে রাতারাতি যে পরিবর্তন, তা স্থায়ী হয় না। বরং কোনোকিছুকে কল্যাণকর জেনে ভেতর থেকে যখন কেউ অনুপ্রাণিত হয়, তখনই আসে স্থায়ী বদল। তাই আগে নিজের কাছে স্পষ্ট করুন 'কেন'-র জবাব। তাহলে যে-কোনো শ্রমসাপেক্ষ কাজ হবে সহজ এবং আনন্দময়।

আজকের কাজ সম্পন্ন হোক আজই

কাজ সম্পন্ন করার দৌড়ে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হলো 'আজ নয় আগামীকাল করব'–এই দুষ্টচক্র, যার আরেক নাম দীর্ঘসূত্রিতা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ভাষায়, You may delay but time will not. গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর উক্তি–'একটি কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তা শুরু করা।'

সেই হিসেবে বছরের শুরুটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নতুন বছরে শুধু আজকের কাজ আজই করার গুণটি যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহলে অনেক কিছুই চলে আসবে নিজের আয়ত্তে। দূর হবে সময়ের সাথে পাল্লা দেয়ার অহেতুক টেনশন, মুক্তি পাবেন জমে থাকা কাজের চাপ এবং অপরাধবোধ থেকে।

তাই প্রতিদিনের কাজের তালিকা সাথে রাখুন এবং সময়কে কাজে লাগান। এতে দিনের সমাপ্তি ঘটবে তৃপ্তি নিয়ে আর প্রতিটি দিন শুরু করতে পারবেন নতুন কর্মোদ্যমে।

তথ্যসূত্র : আত্মনির্মাণ
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস
দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ১ জানুয়ারি ২০১৮
দ্য কনভারসেশন, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

ধ্যানসন্ধ্যায় গুরুজী

২০২০ হোক শতভাগ অর্জনের বছর

বছর শেষে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আনন্দঘন মিলনমেলা–ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে জীবনমুখী আলোচনা উপস্থাপন করছেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে পরিশীলিত ও প্রশান্তিময় করে তুলতে যা রাখছে কার্যকর ভূমিকা।

ডিসেম্বর ২০১৯-এ বিভিন্ন সেন্টার-শাখার আয়োজনে রাজশাহী, সিলেট ও ঢাকার একাধিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয় ধ্যানপ্রভাত ও ধ্যানসন্ধ্যা। এতে অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১০ সহস্রাধিক সদস্য।

নতুন বছরে ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে লক্ষ্য, করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেন গুরুজী। সেইসাথে নতুন মেডিটেশন '২০-এ ২০' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বলেন, ২০২০ হোক শতভাগ অর্জনের বছর। গুরুজীর আলোচনার সার-সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো—

সন্তানকে শুধু ভালো ছাত্র নয় ভালো মানুষ বানাতে হবে

সন্তানকে শুধু ভালো ছাত্র বানালেই অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ভালো রেজাল্ট করা বা ভালো ছাত্র হওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো একজন ভালো মানুষ হওয়া। যে মানুষ অন্যের কল্যাণ ছাড়া কোনো ক্ষতি করবে না। তাহলেই সে হবে দেশের সম্পদ। তাই সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে ভালো মানুষ হিসেবে। আর এই চর্চাটা শুরু করতে হবে একদম ছোট বয়স থেকে।

মা-বাবা ও অভিভাবকরা নতুন বছরে এ বিষয়ে সচেতন হবেন। তাহলে আপনার সন্তান একজন ভালো ছাত্র ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আর ছোটবেলা থেকে ঘরের কাজে তাকে সাথে রাখুন। সন্তানকে স্বাবলম্বী হতে শেখান। তখন সন্তান বড় হয়ে নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে নিজেই নিতে পারবে।

- শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন থেকেই তাকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিন। যেমন, কাগজের টুকরো কোথাও পড়ে থাকলে সেটি শিশুকে তুলতে বলুন এবং উদ্বুদ্ধ করুন ডাস্টবিনে ফেলতে।
- সন্তানের নৈতিক বিকাশের দিকেও খেয়াল রাখুন। তার সাথে যত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন, তার ভালো-মন্দ তত বুঝতে পারবেন। ছেলেমেয়ের খোঁজ রাখা মানে তার সাথে যোগাযোগ বাড়ানো, গোয়েন্দাগিরি করা নয়। অহেতুক কৌতূহলের ফলে সন্তানের সাথে আপনার দূরত্ব বাড়বে।
- সন্তানকে মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করুন। সাদাকায়নে নিয়ে আসুন ও স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ করে দিন। তাহলে সে ইতিবাচক বলয়ে থাকবে।

ফেসবুককে 'না' বলুন বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ বাড়ান

বাংলাদেশে তরুণ জনশক্তির হার তুলনামূলক বেশি। আর যখনই কোথাও সমৃদ্ধি আসতে শুরু করে তখন সারা পৃথিবীর শোষকদের দৃষ্টি পড়ে সেখানে।

গত এক যুগ ধরে পরিকল্পিতভাবে আমাদের সমাজে ভার্চুয়াল ভাইরাসের আগ্রাসন শুরু হয়েছে। ১০ বছর আগেও ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ার এতটা দৌরাত্ম্য ছিল না।

আমাদের সামাজিক বুনন ও চিরায়ত পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়ার কাজটি ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া খুব দক্ষতার সাথেই করে যাচ্ছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, অর্থনীতিতে উদীয়মান প্রতিটি দেশে সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি, অশ্লীলতা সৃষ্টি করছে।

- রান্না করার জন্যে আগুন প্রয়োজন। কিন্তু সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। না হলে সব পুড়ে ছারখার হবে। তেমনি প্রযুক্তি যতক্ষণ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ততক্ষণই প্রযুক্তি কল্যাণে আসবে। আপনি যদি প্রযুক্তিতে আসক্ত হয়ে যান, প্রযুক্তি আপনাকে অঙ্গার বানাবে।
- মাদক, জুয়া বা ভার্চুয়াল আসক্তি–সব আসক্তিই সমান। আসক্ত মানুষ নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে না। একসময় সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। পরিণত হয় অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর মানুষে। তাই সোশ্যাল মিডিয়াকে বর্জন করুন। ফেসবুককে না বলুন। বাস্তবে যোগাযোগ বাড়ান।

১-এর শক্তি ॥ হোজার গল্প

নাসিরুদ্দিন হোজা তখন সমরখন্দের সুলতানের দরবারের সভাসদ। সুলতান জ্ঞান-অনুরাগী মানুষ। কিন্তু অহংকার বেশি। সুলতানকে হোজা দাবা খেলা শেখালেন। এরকম বুদ্ধির খেলা এর আগে সুলতান কখনো দেখেন নি।

এখানে বলা দরকার, দাবা আবিষ্কৃত হয় এই বাংলায়। বাংলা থেকে এটা ভারতে, তারপর আরবে ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ বুদ্ধির দিক থেকে আমরা সবসময় এগিয়ে ছিলাম। এখন শুধু চর্চার প্রয়োজন।

যা-হোক, হোজার দাবা খেলা দেখে সুলতান চমৎকৃত হয়ে বললেন, হোজা তুমি কী পুরস্কার চাও?

হোজা তো এই অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, মহামান্য সুলতান! আমি পুরস্কার চাই ভুট্টা, তবে বিশেষ নিয়মে। আজকের জন্যে মাত্র একটি ভুট্টা।

সুলতান বললেন, তুমি আর কিছুই পেলে না! তোমাকে আমি জ্ঞানী মনে করেছিলাম। এখন তো দেখছি তুমি একটা বোকা। ভুট্টা চাইছ, তা-ও একটা!

হোজা বললেন, দাবাতে ৬৪টি ঘর। প্রথমদিন প্রথম ঘরে একটি ভুট্টা দেবেন। দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় ঘরের জন্যে একের দ্বিগুণ দুইটি ভুট্টা। তৃতীয় দিন এর দ্বিগুণ চারটি ভুট্টা। এভাবে প্রত্যেক ঘরে আগের ঘরের চেয়ে দ্বিগুণ।

সুলতান এবার হাসলেন। নিশ্চিত হলেন, সবাই যে হোজাকে বুদ্ধিমান বলে, আসলে উল্টো। খাজাঞ্চিকে ডেকে তিনি হুকুম দিলেন নিয়মমতো হোজাকে ভুট্টা দিতে।

সুলতানকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোজা বিদায় নিলেন।

২০ তম দিনে খাজাঞ্চি হন্তদন্ত হয়ে সুলতানের সামনে হাজির। তার হাতে বিশাল টালিখাতা। বলছে, হোজাকে যদি এই নিয়মে ভুট্টা দেয়া হয় তাহলে আপনার রাজ্য বিক্রি করতে হবে। তবুও ভুট্টা দেয়া শেষ হবে না। কারণ ৬৪ তম দিনে তাকে দিতে হবে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ছয়শ কোটি মেট্রিক টন ভুট্টা! যা দেয়া অসম্ভব।

সুলতান হোজাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি বোকামি করেছি। তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে।

হোজা বললেন, মহামান্য! জ্ঞানের কোনো শেষ নেই। তাই অহংকার না করাই ভালো। কোনোকিছুকেই তুচ্ছ মনে করবেন না। ১-এর গুরুত্ব অনেক বেশি!

২০২০-এর লক্ষ্য

১ জনকে ধ্যানী ও দাতায় উন্নীত করুন

নাসিরুদ্দিন হোজার মতো আমরাও ১-এর শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই। তাই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রতি আহ্বান–আপনারা প্রত্যেকে একজনের প্রতি মনোযোগী হোন। আপনার আন্তরিক মনোযোগ তাকে ধ্যানী করে তুলবে। তার জীবনে আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন। আর বছর শেষে তার রূপান্তরের অনুঘটক হবেন আপনি। পরের বছর তিনি আর আপনি মিলে আরো দুজনকে বদলানোর চেষ্টা করবেন। এভাবেই ১ পরিণত হবে অনেকে।

একজনকে ধ্যানে ও দানে উদ্বুদ্ধ করবেন যেভাবে–

- এই একজন হতে পারেন আপনার আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন বা প্রতিবেশী।
- তার সাথে বাস্তবে যোগাযোগ করুন, তথাকথিত ভার্চুয়াল যোগাযোগ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়।
- তার আনন্দে-দুঃখে পাশে থাকুন। সাফল্য কামনায় প্রার্থনা করুন। ভালো কাজে তাকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করুন।
- শুক্রবার সারাদেশে ২৫০টির বেশি স্থানে সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এতে থাকে মেডিটেশন ও আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনা। নিজে নিয়মিত অংশ নিন এবং তাকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- সুযোগ থাকলে আলোকায়নে অংশ নিতে উৎসাহ দিন। এটিও উন্মুক্ত কার্যক্রম।
- ভয়-পেরেশানি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ও বঞ্চিতের সেবায় দানের বিকল্প নেই। তবে দান করতে হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে। তাই তাকে দাতা হতে উদ্বুদ্ধ করুন।

মিষ্টির বদলে খেজুর

মিষ্টি কিন্তু বাঙালির ঐতিহ্য নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিষ্টি খেতেও জানত না। ১৭ শতকের শুরুতে ওলন্দাজরা এ উপমহাদেশে এলো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তারাই প্রথম মিষ্টি তৈরি করে দেখাল বাঙালিকে। নষ্ট দুধের ছানায় চিনি ও রং মিশিয়ে তৈরি করল মিষ্টি। সেই মিষ্টিই এখন বাঙালির ঘরে ঘরে।

কিন্তু এখন এই মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ঘন চিনির মতো সাদা বিষ, কেমিক্যাল, এমনকি টয়লেট টিস্যুও। অথচ চিনির কোনোই পুষ্টিগুণ নেই।

স্রেফ স্বাদের জন্যে মিষ্টি খেয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার কোনো মানেই নেই। তাই মিষ্টির বদলে আমরা খেজুর খেতে পারি।

খেজুরের চাহিদা যখন সৃষ্টি হবে তখন দেশে খেজুর আমদানিও বেড়ে যাবে। খেজুরের চাষ হবে। ইতোমধ্যে অনেকেই খেজুর চাষে সফলও হয়েছেন। কারণ বাংলার মাটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর মাটি।

- সামাজিক যে-কোনো অনুষ্ঠানে, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্যে মিষ্টি বর্জন করুন। মিষ্টির পরিবর্তে খেজুর দিন।
- কারো বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় মিষ্টি না নিয়ে খেজুর বা দেশি ফল নিয়ে যান।
- অতিথিকে মিষ্টির পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করুন।
- নতুন জামাই বা বউকে মিষ্টিমুখ না করিয়ে খেজুর দিয়ে স্বাগত জানান। আপনি শুরু করুন। অন্যেরাও এর সুফল বুঝতে পারবে।
- নবীজীর (স) প্রিয় খাবার ছিল খেজুর। তাই সুন্নত হিসেবেও খেতে পারেন। আর খেজুরের রয়েছে বহু পুষ্টিগুণও।

ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের আগ্রাসন থেকে বাঁচুন

ঋণ হচ্ছে গোলামির ফাঁদ। আর ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে, যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয় সেই ব্যাংকের গোলামির সার্টিফিকেট। আপনি ঋণ নিয়ে পণ্য কিনছেন, অর্থাৎ উপার্জনের আগেই ব্যয় করে ফেলছেন। তাহলে আপনার দুর্দশার বৃত্ত কেউ ভাঙতে পারবে না।

ঋণ ও কিস্তির ফাঁকটা হলো–ব্যাংক একজন ভোক্তাকে ঋণ নিতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। কারণ ঋণ নিলে সে কিস্তির ফাঁদে পড়ে যাবে, সুদ দিতে থাকবে। একসময় দেখা যাবে, সুদ শোধ করতে করতে সে আর আসল শোধ করতে পারছে না। তখন সে ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। তার ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাবে। অর্থাৎ তখন সে পরিণত হবে দাসে। তাই সচেতন হোন। ঋণ, ক্রেডিট কার্ড ও কিস্তির ফাঁদে পা দেবেন না।

- ক্রেডিট কার্ড থাকলে তা ব্যাংকে ফেরত দিন। গবেষণায় দেখা যায়, নগদ অর্থে পণ্য কিনলে মানুষ হিসাব করে খরচ করে। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডে অপ্রয়োজনীয় পণ্যই বেশি কেনে।
- ঋণ বা কিস্তি নিয়ে কোনো ব্যবসা করবেন না। করে থাকলে দ্রুত শোধ করে নির্ভার হয়ে যান।
- কোনো ধর্মই সুদ ও ঋণকে সমর্থন করে না। এটা থেকে পানাহ চাইতে নবীজী (স) সবসময় প্রার্থনা করতেন–আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দাইন। অর্থাৎ আমি কুফর (সত্য অস্বীকার) ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (*আবু সাঈদ খুদরী, নাসাঈ শরীফ*)

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমার মেয়ে এবছর এইচএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। সে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যত জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছে সবখানে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তার লক্ষ্য পদার্থবিজ্ঞানে পড়া ও গবেষণা করা। আইনস্টাইন এবং স্টিফেন হকিং তার আইকন। তার মতে, দেশে পড়াশোনার মান তেমন ভালো নয়। তাই তার বিদেশে পড়ার ইচ্ছা। মেয়েকে এখন বিদেশে পাঠানো ঠিক হবে কি? আপনার পরামর্শ চাই গুরুজী।*

উত্তর : পরামর্শটা আপনি চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার মেয়ে তো চাচ্ছে না! এর কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া সবসময় এ ধারণাটাই সৃষ্টি করতে চায় যে, তাদের দেশে যা আছে তা-ই শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের দেশের যা-কিছু তার সবই খারাপ, কিছুই মানসম্পন্ন নয়। তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে, নিজেদের সব ব্যাপারেই আমাদেরকে নেতিবাচক করে তোলা এবং এটা বোঝানো যে, এদেশে থেকে কিছু হবে না। হওয়ার একটাই উপায়–বিদেশে যাওয়া।

আপনার মেয়ের আইকন আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু তার আইকন নয়। কারণ তিনি একজন বাঙালি। আর ছোটবেলা থেকেই আইনস্টাইন ও হকিংয়ের কথা শুনতে শুনতে তার ধারণাটাই হয়তো এমন যে, বিজ্ঞানী হলেও জগদীশ বসু আর কত বড় বিজ্ঞানীই বা হবে?

আইনস্টাইন, হকিং অবশ্যই বড় বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাদের অবদান আমরা অবশ্যই স্মরণ করি। কিন্তু অবদান বিচারে জগদীশচন্দ্র বসুও কম নন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাত্র ২৪ বর্গফুটের পরিত্যক্ত একটি কক্ষে গবেষণা করে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ ও গাছের প্রাণ-সংক্রান্ত তত্ত্বসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন তিনি করেছেন। বিজ্ঞানের জগতে তিনি ওয়াই-ফাই তত্ত্বের জনক হিসেবে স্বীকৃত।

তো, গলদ আসলে আমাদের বিদ্যার গোড়াতে। আইকন হিসেবে পাশ্চাত্য মিডিয়া যাদের তুলে ধরে, তার বাইরে আমাদের অধিকাংশেরই কোনো ধারণা নেই। অথচ এমন বহু আইকন আমাদের দেশেই রয়েছেন। কিন্তু আমরা তাদের আইকন হিসেবে নিতে পারি না। কারণ আমাদের কাছে স্বদেশি ঠাকুরের চেয়ে বিদেশি কুকুরও অনেক বেশি আদরণীয় এবং এটা প্রায় দুশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফল।

আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, এইচএসসি-র পর পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি ছাড়া ছেলে বা মেয়েকে বিদেশে পাঠানো একেবারে বোকামি। আর ঋণ করে কখনো পাঠাবেন না। ফুল স্কলারশিপ বা ফান্ডিং-এর ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে বিদেশে তার পড়াশোনা কখনোই হবে না। ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে কিছুদিন পরে সে হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা। ভালো পড়াশোনা দেশেও হলো না, বিদেশেও হলো না।

আর ইউরোপ-আমেরিকায় পড়াশোনা হচ্ছে এখন একটা লাভজনক ব্যবসা। তাদের আংশিক বৃত্তিটাও একটা ফাঁদ। কারণ আংশিক বৃত্তিধারীরা একসময় শিক্ষা-ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং কিস্তির চক্রে জড়িয়ে পড়ে। এসব বাধা পেরিয়ে যদিও-বা সে পড়াশোনা শেষ করতে পারে, তারপর তার কর্মজীবনের অন্তত প্রথম ১০ বছর চলে যায় ঐ শিক্ষা-ঋণ শোধ করতে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই এখন রমরমা বাণিজ্য এবং কিছু বিশ্ববিদ্যালয় টিকেই আছে শুধু এর ওপর ভিত্তি করে। এ-ছাড়া বিদেশে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যাদের শিক্ষার মান আমাদের বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আহামরি কিছু নয়।

অতএব পড়াশোনার জন্যে বিদেশে যাওয়া যেতে পারে, তবে কখনোই সেটা স্নাতক বা আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে নয়; বরং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যেতে পারে যদি পূর্ণ শিক্ষাবৃত্তি থাকে। অবশ্য শিক্ষাবৃত্তি থেকেও বিদেশে ট্যাক্স কাটা হয়। তারপর অন্যান্য ব্যয় তো আছেই। এসব খরচ যদি একজন ছাত্র বহন করতে পারে এবং সেইসাথে পড়াশোনায় আন্তরিক হয়, তাহলেই সে পড়াশোনা শেষ করতে পারে।

আপনি আমাদের পরামর্শ চেয়েছেন, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টা পরিষ্কার করলাম। এখন মেয়েকে বোঝানোটা আপনার দায়িত্ব। কীভাবে বললে সে বুঝবে, অভিভাবক হিসেবে আপনিই তা ভালো বুঝবেন।

আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করেছি। তিনি যদি সেই যুগে দেশীয় কারিগরের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে দেশে গবেষণা করতে পারেন এবং বিজ্ঞানের জগতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যেতে পারেন, তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন এত রকম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সেটা পারবে না?

আর যখন সে যোগ্য হবে, ফুল স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে, তখন অবশ্যই যাবে। কারণ জ্ঞানার্জনের জন্যে তৎকালীন আরবের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান চীনে যাওয়ার কথা তো স্বয়ং নবীজী (স) বলে গেছেন।

প্রশ্ন : *নামাজের সময় মনটা শুধু টেনিস বলের মতো জাম্পিং করে। মনটাকে স্থির করে নামাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করব কীভাবে?*

উত্তর : আপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো দিক হলো, আপনার মন যে টেনিস বলের মতো জাম্পিং করছে, এটা আপনি বুঝতে পারছেন। এই সচেতনতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মন যে অন্যদিকে চলে গেছে, অধিকাংশ মানুষ এটাই বোঝে না। আপনি তাদের চেয়ে অন্তত একধাপ এগিয়ে আছেন।

দ্বিতীয়ত, নামাজে মনোযোগ বাড়াতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে, কেন আপনি নামাজ পড়ছেন? আমাদের অধিকাংশের কাছে এই কেন-র উত্তর নেই। কেন পড়ছি, এটা যখন নিজের কাছে পরিষ্কার হবে, তখন দেখবেন মনোযোগ বেড়ে গেছে।

আরেকজন প্রশ্ন করেছে, কলেজে ক্লাস করতে ভালো লাগে না। বিরক্তি আসে, একা একা লাগে। নেতিচিন্তা আসে।

এ-ক্ষেত্রেও একই উত্তর। সে কেন পড়ছে, কলেজে কেন যাবে–এটা তার কাছে পরিষ্কার না। তার সামনে যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকত এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যদি কলেজে যেতে হতো, তখন বিরক্তি নেতিচিন্তা কিছুই আসত না।

অর্থাৎ কেন আমি পড়াশোনা করব, কেন পরিশ্রম করব, কেন নামাজ পড়ব, এই কারণটা নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে।

তবে এটা ঠিক যে, নামাজের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করে। যে কথাগুলো সারাদিন মনে পড়ে নি, নামাজের সময় সে-কথাগুলো সামনে চলে আসে। এসময় বিরক্ত না হয়ে মনটাকে আবার নামাজে নিয়ে আসুন এবং স্মরণ করুন, আমি আমার মহান প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। লক্ষ্যটা যদি পরিষ্কার হয়, আজ কাল পরশু আপনি অবশ্যই পারবেন, যদি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথমত, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। দ্বিতীয়ত, মনোযোগায়নের জন্যে আপনি একটি অনুশীলন করতে পারেন–ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটায় মনোযোগ নিবদ্ধ করে মনোযোগ বাড়ানোর চেষ্টা। (*সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড*)

তৃতীয়ত, তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে নামাজে দাঁড়ান। চোখ বন্ধ করে কয়েকবার দম নিন দম ছাড়ুন। এরপরে অনুভব করুন আপনি কাবা শরীফে আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। এরপর চোখ মেলুন। নিয়মমতো নামাজ আদায় করুন। যত চর্চা করবেন, তত আপনার মনোযোগ বাড়তে থাকবে। কারণ কিছু পেতে হলে দরকার সাধনা, দরকার লেগে থাকা।

আর প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তের নামাজ একই সময়ে পড়ুন। যেমন, একজন মানুষ যদি প্রতিদিন একই সময়ে খান, ঐ সময় হলেই তার ক্ষুধা লেগে যায়। ঠিক তেমনি যখন একই সময়ে নামাজ পড়বেন, তখন দেখবেন সময় হলেই আপনার দেহ-মন নামাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এজন্যে সময়মতো কাজ করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আর কোয়ান্টামের একটি প্রত্যয়ন হলো, 'আমি হৃদরিল ক্বালব বা একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ব। নামাজে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমার মন সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর প্রতি রুজু হবে। ফলে প্রতিটি সেজদা পরিণত হবে মেরাজে। আমার হৃদয় ভরে উঠবে অনন্ত প্রশান্তিতে।' মনে মনে এ প্রত্যয়ন আপনি চর্চা করুন। আমরা দোয়া করি, নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে যেন আপনি হৃদরিল ক্বালব বা একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করতে পারেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি আশাবাদী, সুবিচারক ও দক্ষ। আমার ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা বাড়ছে। আমি সময় ও নিয়মানুবর্তী হচ্ছি। সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। কল্যাণকর ধ্যানধারণার আলোকে জীবনকে গুছিয়ে নিচ্ছি।

লাখো বঞ্চিতের পাশে সিকি শতাব্দী জুড়ে

মেডিটেশন ও ইতিবাচকতার চর্চার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের আত্মপ্রকাশ ১৯৯৩ সালে। এ কর্মপ্রয়াস শুধু আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ১৯৯৬ সালে সৃষ্টির সেবার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এরপর সিকি শতাব্দী জুড়ে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে নানাবিধ সেবা কার্যক্রম।

স্বাস্থ্যসেবা

শুরু থেকেই দুস্থ-বঞ্চিতদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে কোয়ান্টাম। লামার প্রত্যন্ত জনপদের পাশাপাশি ঢাকার মিরপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ফেনীতেও নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।

স্বাস্থ্যসেবা : পেয়েছেন মোট ৩,৩৬,৫৩১ জন।

মাতৃমঙ্গল : এ কার্যক্রমের আওতায় সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন ১০,৬০৭ জন দরিদ্র ও অসহায় মা।

চক্ষুসেবা : বান্দরবানের রাজবিলায় এ সেবা পেয়েছেন ৪,৬৮৪ জন। ছানি অপারেশন হয়েছে ৫৪২ জনের।

শিক্ষা

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ : ২০০১ সালে স্কুলটি শুরু হয় সাত জন ছাত্র নিয়ে। এখন শিক্ষার্থী আড়াই হাজার। এ স্কুলের পাসের হার শতভাগ। প্রতিবছর বুয়েট, মেডিকেল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে এ শিক্ষার্থীরা।

রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ : ২০১৫ সালে ঢাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের নিয়ে পরিচালিত এ স্কুলটির সার্বিক দায়িত্ব নেয় কোয়ান্টাম। এ পর্যন্ত সহযোগিতা পেয়েছে ১,০৫৭ জন শিক্ষার্থী।

শিক্ষাবৃত্তি : বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১,২৬১ জন অসচ্ছল শিক্ষার্থী পেয়েছে শিক্ষাবৃত্তি।

স্বনির্ভরায়ন

অসহায়ের কর্মসংস্থান, প্রতিবন্ধীদের সহায়তা ও অসচ্ছল মানুষকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের রয়েছে কয়েকটি উদ্যোগ।

গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন : দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন ২,৯৯০ জনকে নিরাপদ পুনর্বাসন করা হয়।

সেলাই প্রশিক্ষণ : সেলাই মেশিন পেয়েছেন ৪৪৪ জন। আর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৪৭৯ জনকে।

পশুপালন : হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করে স্বনির্ভর হয়েছেন ৫৮৬ জন।

সিএনজি/ অটোরিকশা : প্রদান করা হয় ৪৪ জনকে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

মোট সরবরাহ ১১,৬৩,৯৬০ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান

গত বছর নভেম্বর মাসেই এক লক্ষ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। বর্তমানে আমাদের দেশে বছরে প্রায় সাত লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। আর কোয়ান্টাম ল্যাব থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে এক লক্ষ ইউনিটের বেশি।

২০১৯ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহ করা হয় ১,১৪,৩৫৩ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান (৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)। সম্প্রতি ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে সবাই যখন উদ্বিগ্ন, তখন জরুরি রক্ত উপাদান প্লাটিলেট নিয়ে মুমূর্ষু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

এ-ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগে, অগ্নিদগ্ধ রোগীর প্রয়োজনে, ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব। এ ধারাবাহিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে স্বেচ্ছা রক্তদাতা ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যে।

অন্যান্য সেবা কার্যক্রম

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় স্টেডিয়াম, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকায় ২০১২ থেকে নিয়মিত চলছে এ কার্যক্রম।

দাফন ও সৎকার : শুরু ২০০৪ সাল। এ পর্যন্ত ৫৪৮টি পরিচয়হীন বা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকার করা হয়েছে ।

সুন্নতে খতনা : ২০০৫ সালে থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমে সেবা পেয়েছেন পূর্ণবয়স্কসহ ১,৮৭,১২৭ জন শিশু-কিশোর।

প্রবীণ সেবা কার্যক্রম : অসহায় প্রবীণদের জন্যে বান্দরবান লামায় নতুন এ সেবা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ২০১৯ সালে।

বিশুদ্ধ পানি : ১৯৯৯ সালে শুরু। ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮৮টি টিউবওয়েল ও দুইটি ইঁদারা স্থাপিত হয় দেশের উপকূলীয় পাহাড়ি এলাকায়।

বিকশিত হোন আত্মশক্তিতে

অফুরন্ত জীবনীশক্তির আধার প্রতিটি মানুষ। মন ও মস্তিষ্কের এ শক্তিকে বিকশিত করতে প্রয়োজন সঠিক প্রক্রিয়ায় অনুশীলন। এমনই কিছু আয়োজন রয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের জন্যে।
এ কার্যক্রমগুলোতে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে আপনি আবিষ্কার করতে পারেন নিজের সুপ্ত শক্তিকে, মেধা ও যোগ্যতাকে। যা শুধু নিজের বিকাশে নয়, সমাজের কল্যাণেও ভূমিকা রাখছে নানাভাবে।

হিলিং সাইকি কার্যক্রম

সাফল্য, নিরাময়, সুসম্পর্ক ও প্রশান্তির দুয়ার খুলে দেয় প্রার্থনা। নিজের ও অন্যের কল্যাণের জন্যে প্রার্থনার এ শক্তিকে বহুগুণে কাজে লাগানোর দক্ষতা আপনি অর্জন করবেন কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। নিমগ্ন প্রার্থনার ফলে আপনার ও আপনার পরিবার-পরিজনের জীবনে সৃষ্টি হবে বহুমুখী সাফল্য। তাই ধ্যানের স্তরে প্রার্থনার প্রক্রিয়া জানতে অংশ নিন এ কার্যক্রমে।

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ওরিয়েন্টেশন

বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর দেড় কোটির বেশি মানুষ মারা যান হৃদরোগে। বাংলাদেশে প্রতি সাত জনে একজন মানুষ প্রাণ হারান হৃদরোগের কারণে। চিকিৎসা-গবেষকদের মতে, এ রোগের অন্যতম নেপথ্য কারণ হলো প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, না-শুকরিয়া ও স্ট্রেস। তাই দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাচারের পরিবর্তন ছাড়া শুধু ওষুধ বা সার্জারি কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। হৃদরোগের কার্যকরী প্রতিরোধ ও নিরাময়ের সহজ সূত্রগুলো নিয়েই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের দুই দিনের কার্যক্রম। এতে আরো রয়েছে ডায়াবেটিস, মেদস্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপ থেকে আরোগ্য লাভের দিক-নির্দেশনা।

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম

সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা বলছেন, বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোর-তরুণদের আত্মকেন্দ্রিকতা, পরিবার-বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতার বড় কারণ হলো মা-বাবা অভিভাবকদের ভ্রান্তচিন্তা ও ভুল প্যারেন্টিং। ভালো-মন্দের পার্থক্য না বুঝে অনুকরণ করার প্রবণতাকে তথাকথিত স্মার্টনেস মনে করছে তরুণ সমাজ। এ থেকে মুক্তি পেতে সন্তানদের দিতে হবে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা। মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে, সন্তানের সাথে গড়তে হবে মমতার সেতু। এ কৌশলগুলো জানতে অংশ নিন প্যারেন্টিং প্রোগ্রামে। গড়ে তুলুন প্রত্যয়ী ও মানবিক নতুন প্রজন্ম।

ক্লাসে ১ম জীবনে ১ম

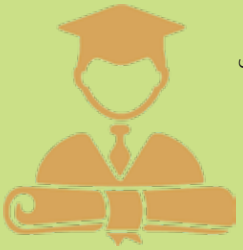

ভালো রেজাল্ট, ভালো শিক্ষার্থী ও ভালো মানুষ– এই লক্ষ্য নিয়ে কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন। একজন শিক্ষার্থী যখন ক্লাসে ১ম হওয়ার সাথে সাথে জীবনে ১ম হওয়ার মন্ত্রগুলো আয়ত্ত করতে পারে, তখনই স্থায়ী হয় তার সাফল্য। শিক্ষার্থী প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে জানবেন বুদ্ধিদীপ্ত, চৌকস, দায়িত্ব-সচেতন হওয়ার ধাপগুলো এবং হয়ে উঠবেন সমমর্মী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একজন মানুষ। ধাপে ধাপে সুন্দর ও সার্থক জীবনের দিকে অগ্রসর হবেন আপনি।

কোয়ান্টাম ইয়োগা

আধুনিক মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন নানামুখী কাজে। এই কর্মব্যস্ত জীবনে শারীরিক সক্ষমতার সাথে প্রয়োজন মানসিক স্থিরতাও। কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা বাড়াবে আপনার প্রাণশক্তি ও কর্মস্পৃহা। নিশ্চিত করবে দেহের অঙ্গসমূহ, স্নায়ু, পেশি, গ্ল্যান্ড ও ত্বকের সুস্থতা। তীক্ষ্ণ হবে স্মরণশক্তি, স্ফূরণ ঘটবে মেধার। যুক্ত হোন কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চায়। অর্জন করুন সুস্থ দেহ সতেজ মন।

প্রথমায়ন

ধারাবাহিক সাফল্যের সমষ্টিই সফল জীবন। আর এ প্রাপ্তির নেপথ্যে থাকে ছোট ছোট সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি প্রয়োজন দক্ষতা ও সততার সুন্দর সমন্বয়। লিডারশিপ, টিমওয়ার্ক, আসক্তিমুক্তি ও কর্মক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠার সুনিপুণ প্রক্রিয়া জানতে অংশগ্রহণ করুন প্রথমায়ন কার্যক্রমে।

হোন বিশ্বমানের টেকনোটিয়ার

তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান আজ অপরিহার্য। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যারাই এ জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছে, তারাই এগিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো বয়সী মানুষের জন্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান হাতে কলমে শেখা ও আয়ত্ত করার ব্যতিক্রমী কার্যক্রম আইসিটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। অংশ নিন, জানুন কম্পিউটার প্রযুক্তির খুঁটিনাটি সম্পর্কে। হয়ে উঠুন স্বনির্ভর ও প্রযুক্তিদক্ষ। মানবতার কল্যাণে হোন বিশ্বমানের টেকনোটিয়ার।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০২০ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd